সৈয়দ হক, *জনক ও কালোকফি* এবং
মুশতাকগণের মানসিক পরিভ্রমণ

ড. ফজলুল হক সৈকত

জনক আর কালোকফির মধ্যকার সম্পর্ক আর লেখকের অনুভবের ব্যাপারটি বুঝবার আগ্রহ থেকে আমার পাঠে প্রবেশ। সাধারণ পাঠে লক্ষ্য করলাম– *জনক ও কালোকফি* (রচনাকাল: ১৯৬৩) নামক কাহিনিটির নামকরণে জনকের কথা থাকলেও বিবরণ ও পরিভ্রমণ পরিসরে গল্পকথক মুশতাক তার জননীর জন্য একধরনের ভাবকাতরতার প্রহর যাপন করেছেন। এরপর বিষয়টির নিবিড় পাঠের প্রয়োজন পড়লো। তখন দেখা গেলো শুধু গল্পকথক নন; অগণন মানুষ এই মানসিক পরিভ্রমণ আর আপন-অস্বিত্বের টানাপড়েনে আটছে আছে অনন্তকাল ধরে– থাকবে আরও বহুকাল। কাজেই, মুশতাক একা নয়– অনেকের সমষ্টি; আর তাই মুশতাকগণের অভিজ্ঞতা-অভিপ্রায় আর অভিমানকে খানিকটা স্পর্শ করবার জন্য এবং তার আপাত ফলাফল অভিনিবেশী পাঠককে জানানোর জন্য তৈরি হলাম শেষ অবধি।

সৈয়দ শামসুল হক (জন্ম: ২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫, কুড়িগ্রাম, বাংলাদেশ) লেখক জীবনে যে তিন সত্য ও নির্দেশনাকে ধারণ ও লালন করে চলেছেন, তা তাঁর পাঠকের কাছে হয়তো এতদিনে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমরা জানি, চেতনার বীজ বপন করে বুদ্ধির ফসল ফলাতে পারেন খুব কম মানুষ। যারা এই কঠিন কাজটি করেন তারা মস্তিষ্ক চাষী; শিল্পের কৃষক। দু'হাতে তারা বপন করেন ফলবান বীজ ও দরদ; দূর করেন অন্ধকারের আগাছা। তাদের নিরলস চেষ্টায় অনুভবের নিবিড় জমিনে ফলে ওঠে চৈতন্যের স্নিগ্ধ ফসল। কালের পলিমাটিতে সে ফসল আলোর হাওয়ায় বাড়তে থাকে। সৈয়দ হক সেইসব মস্তিষ্ক চাষীদেরই একজন। তিনি তাঁর পিতার অভিজ্ঞান থেকে লাভ করেছেন চিন্তা প্রকাশের ভার ও সামর্থ্য; যেন উত্তরাধিকারের সম্পত্তি! সৈয়দ হক সত্য-অনুভব-অনুসন্ধান এবং তাঁর প্রয়াত জনকের অদৃশ্য নির্দেশনা সম্বন্ধে আমাদেরকে জানাচ্ছেন– তাঁর বাবা কলকাতায় মেডিকেল সায়েন্স পড়তে গিয়ে প্রথম দিনের ক্লাসে ইংরেজ শিক্ষকের কাছে শোনা একটি কথা সারাজীবন চেতনায় ধারণ করেছিলেন। আর সে সব কথার মাধুরী হাতে মেখে কলম চালানোর শক্তি লাভ করেছেন পীর পরিবারের বাতি জ্বালানোর উত্তরাধিকারী এই কথানির্মাতা। শোনা যাক তাঁর সেই আপন-ভাষণ: 'কথাটি পরবর্তীকালে বালক আমাকে বহুবার তিনি বলেছেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত হোমিও রইসি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদেরও তিনি বলতেন; সেই কথাটিকে আমি আমার লেখক জীবনের বীজমন্ত্র হিসেবে আজো দেখি। ইংরেজ সেই শিক্ষকটি বলেছিলেন: ভালো ডাক্তার হতে হলে চাই তিনটি গুণ– সিংহের হৃদয়, ঈগল পাখির চোখ এবং নারীর হাত। আজ আমি যখনি কলম ধরি, স্মরণ করি কথাগুলো। একজন লেখকেরও হৃদয় হবে সিংহের মতো, হবে সে অকুতোভয়; চোখ ঈগল পাখির মতো, কোনো কিছুই দৃষ্টি এড়াবে না তার; হাত হবে নারীর মতো মমতায়, জননীর মতো কল্যাণমাখা। বলতে পারি ওই তিন থেকে আমি সজ্ঞানে কখনো সরে আসিনি।' জনকের ব্যাপারে মুশতাকের কাছে আরো কিছু তথ্য আবশ্য আমাদের জানা হয়ে ওঠে। তার জনকের কবর দেওয়ার দিন আর পরবর্তীকালে চাচাদের কাছে লালিত-পালিত হবার সময়কার অন্তত দুটি বিষয় আমরা আঁচ করতে পারি– এক. 'গ্যাদা, শীগগীর আসো। তোমার বাপেরে না মাটি দিতাছে, দেখবা না? ব্যাস এইটুকু। আর কিছু মনে নেই। আমি গিয়েছিলাম কী গিয়েছিলাম না, দেখেছিলাম কী দেখেছিলাম না– কতদিন ভাবতে চেষ্টা করেছি– একেবারে শাদা, কুয়াশার মতো। কিন্তু মনে পড়ে না।'; দুই. 'চাচারা খুব কালো মুখ করে দেখতেন আমাকে। আমি সেই ছোটবেলা থেকেই জানতাম, যাদের বাবা নেই তাদের কেউ নেই।'

কলমপেষায়– কবিতা ও কথানির্মাণে, নাটকের আবহ তৈরিতে, রাজপথে ও মঞ্চে অবস্থান ও প্রকাশে পিতাগতপ্রাণ সৈয়দ হক কি তাহলে দায়শোধের অপ্রতিরোধ্য ভার থেকে খানিকটা মুক্তি পাবার

আশায় জনককে নিয়ে সাজিয়েছেন উপন্যাসের ক্যানভাস? আর, তাই যদি হবে, তাঁর জনকের সাথে কালোকফির সম্পর্কটাই বা কিসের? পিতার প্রতি শ্রদ্ধা আর কফির প্রতি আকর্ষণ কিংবা বিকর্ষণের কোনো যোগসূত্র আছে কি-না, তার প্রাথমিক পাঠোদ্ধারের জন্য, আমাদেরকে, নিরুপায় হয়ে, কাহিনি নির্মাতার একটি বিবরণের সাহায্য নিতে হয়। প্রথিতযশা এক অ্যাডভোকেটের জুনিয়র মুশতাক তাঁর বসের শ্যালিকা রুমিকে নিয়ে একধরনের ভয় অনুভব করে। মুশতাকের প্রিয়তমা কলেজ শিক্ষক নিশাতের মতো ফর্সা নয় মেয়েটি। ভয় কি সে কারণে? জানা হয় না মুশতাকের। অবশেষে সে আবিষ্কার করে ব্যাপারটা। তার কথা: 'পরে একদিন আবিষ্কার করেছি ভয়ের কারণটা। চিন্তা করে নয়, ভাবনা করে নয়, কিছু না। একটা রেস্তোরাঁয় বসে কফি খাচ্ছি– কালো, দুধ ছাড়া– কোন একটা উপন্যাসে পড়েছিলাম কে যেন কালো কফি খেতে ভালবাসত– সেই থেকে অভ্যেসটা। নাকে এসে লাগছিল র'কফির ঝাঁঝালো মিষ্টি ঘ্রাণ আর ধোঁয়ায় বারবার মেঘলা হয়ে যাচ্ছিল আমার চশমার কাচ, তখন হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললাম কারণটা। ভয় আমার জীবিকার উপার্জনের, প্রতিষ্ঠার। কাজি সাহেব যদি বলেন আর আমি রুমিকে বিয়ে না করি, তাহলে আমাকে তাঁর চেম্বার ছেড়ে দিতে হবে– এইটেই আমার অজ্ঞাতে জন্ম দিয়েছে ঐ ভয়টাকে।'– এই হলো কালোকফির মাহাত্ম্য! কফির সাথে এখানে সরাসরি জনকের কোনো সম্পর্ক আমরা খুঁজে পাবো না। কালো ও গরম কফিতে চুমুক দিয়ে বোধহয় ভাবুক-উচ্চাকাঙ্ক্ষি-তরুণ ও অবিবাহিত মুশতাক ভীষণ একাকিত্ব (স্বপ্নের নায়িকা নিশাতকে হারাবার ভয়!) আর টাকাজনিত প্রতিপত্তির লড়াইয়ের কাছে হেরে যাবার আশঙ্কার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।

মুশতাক স্বপ্নবাজ তরুণ। হবু বউকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে দেখে রাত পার করে সে। বউয়ের নিত্যদিনের কাজকর্মের একটা (না, অনেকগুলো বোধহয়) ছবি সে নিজে নিজে বানিয়ে তুলে রাখে মনের তাকে। মাঝে মধ্যে রাতের অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে চায় তার অনেক-চাওয়ার নারী নিশাতকে। নিশাতকে ময়ূরের মতো মনে করে সে। সম্ভবত সাবলেট কিংবা পেইংগেস্ট হিশেবে বসবাস করে বন্ধুর বাড়িতে। এই বন্ধুর বছর বছর বাচ্চা উৎপাদন-করা বউটি একধরনের সহানুভূতি প্রকাশ করে মুশতাকের জন্য। মুশতাক নারীর স্বভাব নিয়ে শোনা কথাগুলো মনে মনে আওড়ায়। সে শুনেছে– নারীরা বড়ো চাপা, নীরব চোখের নাচনে প্রকাশ করতে চায় মনের কথা; ভালোবাসার পুরুষের অপ্রিয় অভ্যাসও পছন্দ করে; অন্য নারীর প্রশংসা শুনলে রাগ করে; পুরুষের চোখ দেখে নাকি সব বুঝতে পারে। পাশাপাশি পুরুষের প্রবণতাও বাদ যায় না মুশতাকের মনোজাগতিক পরিভ্রমণের ছায়াছবি থেকে। সে ভাবে– ব্যাচেলর যে-কোনো পুরুষ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে দেখলে সন্দেহ করে; নারীর প্রতি দুর্বলতার জন্য পুরুষের তেমন বদনাম হয় না। আর একবার সে সকল নারী-পুরুষকে চিন্তার অন্য পাতায় রেখে নিজেকে ভিন্ন মানুষ ভেবেছিল– পড়াশোনা শেষ করে জুবিলি স্কুলে ক্লাস সেভেন-এইটে ইতিহাস পড়ানোর সময়কালে, যখন কালিতে আচ্ছন্ন অন্ধকার রেস্তোরাঁয় পায়া-ভাঙা টেবিলে বসে চা খেতো, তখন। তার নিজের বর্ণনাটা এখানে হুবহু তুলে দেওয়া হলো: 'রোজ সন্ধ্যায় সেখানে ফ্লাস বসতো। কোনদিন হারতাম, কোনদিন জিততাম। আমার ভাগ্যে চূড়ান্ত কিছু লেখা ছিল না। অনেকে ছিল রোজ হারতো, আবার অনেকে জিতে যেত দিনের পর দিন। দেখতাম, কেবল আমিই আলাদা। গোবিন্দ যখন চপ দেয় তখন সঙ্গে ছোট্ট ভিনিগারের শিশি আসে। সে শিশিটা কেউ খোলে না। বিস্বাদ নাকি। কিন্তু টেবিলে নিত্য আসা চাই। আমার অস্তিত্ব ছিল ঐ ভিনিগারের শিশিটার মতো।' ঠিক ওই ঘোরলাগা সময়ে নিশাতের সাথে মুশতাকের দেখা; যেন অস্তিত্বহীন এক পুরুষ মানুষের সাথে কোনো এক নারী মানুষের কিংবা বলা চলে পরিচয়হীন মুশতাকদের সাথে চিরকালের আশা-জাগানিয়া নিশাতদের সরাসরি সাক্ষাৎ ঘটে! আর এভাবেই হয়তো বয়ে চলে জীবনের আধমরা নদ ও নদী!

নিশাত ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে। স্কলারশীপ নিয়ে বিদেশে যাবার সম্ভাবনা আছে তার। ফিরে হয়তো সোজা যোগ দেবে ইউনিভার্সিটিতে। মধ্যবিত্ত এই মেয়েটি খানিকটা স্বাধীনও বোধকরি। বয়ফ্রেন্ড কিংবা প্রেমিককে সময় দিয়ে বাসায় ফিরে ট্রাফিক জ্যামের অজুহাত দাঁড় করানোর অবস্থা যখন জমে ওঠেনি ঢাকায়, তখন সে অনায়াসে কলেজ ছুটির পর মুশতাকের সাথে রিক্সায় কিংবা বেবিট্যাক্সিতে চেপে এদিক-ওদিক গিয়েছে। চাইনিজ রেস্টুরেন্টে বসে আড্ডাও দিয়েছে বিনা সংকোচে। আর পোশাকে ও চলনে মেয়েটি বেশ সরল ও বাঙালিপনায় আসক্ত। নিশাতের জন্য পাড়ার নোংরা চায়ের দোকানে কিংবা পাশের রাস্তায় প্রতীক্ষার বহু প্রহর কাটিয়েছে জুনিয়র অ্যাডভোকেট মুশতাক। ঠিক এরকম জায়গায় মুশতাক কোনো বিচ্ছিন্ন মানুষ নয়; হাজারো ভাবুক-প্রেমিকের প্রতিনিধি। মুশতাকগণেরা এইভাবে নিশাতদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে পথের মোড়ে, মহল্লার অপরিচ্ছন্ন চায়ের দোকানে বসে বিড়ি ফোঁকে। বেবিট্যাক্সিতে প্রেমিকার পাশে গা ঘেঁষে বসে চুলের (অথবা ব্যবহৃত শ্যাম্পুর!) গন্ধ নেয়। মনে মনে, নিশাতদেরকে (রুমিদের কথাও মনে আসে কখনও কখনও) নিয়ে ঘরকন্যা করার নানান কাঁচাপাকা ছক আঁটে ঘোরলাগা এই মুশতাকগণ।

জনক ও কালোকফিতে সৈয়দ হক অনেক কথা বহু চিন্তা আর প্রচুর বিষয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। মাঝে মাঝে বর্ণনা কেমন যেন ছাড়াছাড়া– মনে হতে পারে কথাগুলো ঠিকমতো সাজানো হয়নি কিংবা গল্পের অথবা কাহিনির কোনো আগপিছ নেই। তবে অনেক ছবির গোছানো-অগোছানো অ্যালবামের মতো পাতা উল্টাতে উল্টাতে কাহিনিটির পাঠক হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো মায়ের মুখের সামনা সামনি হন। জনকের গল্পের আড়ালে যেন উঁকি দিলো আমাদের প্রত্যাশিত জননীর মায়ামাখা মুখের ছবি ও ভেতরের সত্যাসত্য। কল্পনা আর স্বপ্নের মোড়তে বাঁধা এই গল্পের বাস্তব-পরিসর পাঠকের কাছে হাজির হয় রাজ্যের সব বিস্ময় আর আনন্দ-বিষাদ নিয়ে। গল্পনির্মাতা শূন্যতা আর পূর্ণতার লুকোচুরির মধ্যে অসম্ভব এক মিশেল তৈরি করে চলেন জীবনের সব অনুভবের ছোঁয়ায়; তখন মনে হতে থাকে শূন্যতার পীঠে প্রত্যাশার বাতি জ্বালানোর দক্ষ কোনো কারিগর সৈয়দ হক আমাদের চেনাজগতের পাশ থেকে তুলে এনে কী সব দারুণ অকল্পনীয় সত্য বিষয়াদি পরিবেশন করছেন! ছাব্বিশ বছর পরে মুশতাকের জননী দর্শনের ঘটনার বিবরণ তো ওই রকম এক উপলব্ধিরই ধারাভাষ্য মাত্র। মুশতাকের স্বপ্নচোখে আঁকা চিয়ায়ত বাঙালি মায়ের ময়লাজমা পুরনো-আধাছেঁড়া শাড়ি, খালি পা, রুপোর হাঁসুলি গলায় শিথিল-শ্যামল, মলিন-দুঃখী জড়সড় চেহারা আর পুঞ্জীভূত অবোধ মমতার মৃত রেখায় গড়ে-ওঠা চিরচেনা মুখের আড়ালে কাহিনিকার ঝলমলে অলঙ্কার ও শাড়িতে মোড়ানো পানের রসে রাঙা ঠোঁটের যে ফর্সা-ভারী-থলথলে মুখের মা-কে হাজির করেছেন তা সত্যিই আগ্রহ-উদ্রেককারী ব্যাপার বটে! মুশতাকদের স্বপ্নে দেখা কিংবা না-দেখা মায়ের ভেবে রাখা ছবি ও মুখ এখানে অনুপস্থিত; উপরে স্বচ্ছ আকাশ, নিচে অতল নদী, প্রত্যাশার বেহেশতের বারান্দা, হারিকেনের চলমান আলো আর পায়ের তলার তকতকে মাটি– সব কিছুকে মাড়িয়ে স্বপ্নের ছবিকে খানখান করে জীবন্ত অস্তিত্বের ওপর যেন নির্মিত হয় এক প্রবল আঘাত। চিরায়ত 'মা' বোধকরি তখন, কালোকফির ধোঁয়ার আড়ালে জনকের ছবির পেছনে জননী হয়ে উঠল। মুশতাকের মা-দর্শনের অনুভূতিকে সৈয়দ হক সাজাচ্ছেন এরকমভাবে: 'না বিস্ময়, না ভীতি, না কিছু। চেনাও মনে হলো না, অচেনাও নয়। দুরেরও না কাছেরও না।...আমি কদমবুসি করলাম। নিঃশব্দে তিনি সেটা গ্রহণ করলেন।...তিনি চলে গেলেন। আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম। একটা ঝড়ের মতো দৃশ্যের অবতারণা হবে ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু তার বদলে দেখলাম ঠাÈা, নিস্পৃহ, নিরাসক্ত একটি মানুষকে। তাঁর সঙ্গে আমার রক্তের নয়, যেন লৌকিকতার সম্পর্ক। তার সঙ্গে কেবল কুশলাচার বিনিময় আর সাংসারিক উন্নতি-অবনতির সংবাদ ছাড়া আর কিছুই দেয়া নেয়া যেন চলতে পারে না।' সারা দুনিয়ায় সাড়াজাগানো ম্যাক্সিম গোর্কির *দি মাদার*, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শওকত ওসমানের *জননী* কিংবা জসীম উদ্দীনের *মা যে জননী কান্দে*র আবহ ও পরিবেশের বাইরে এ এক অন্য জননীর সন্ধান দিলেন সৈয়দ শামসুল হক। বোধকরি জননীর গল্প না বলে জনকের কাহিনি সাজানোর পেছনে এটি একটি

প্রাথমিক ও অগ্রগণ্য কারণ। মুশতাকের মানসিক পরিভ্রমণের ভেতর দিয়ে আমরা যেন জনক নয় বরং জননীর গল্পগাঁথাই পাঠ করতে থাকি; যে জননীকে কালোকফির ধোঁয়ার হালকা অন্ধকারের আড়াল থেকে সতর্ক চোখে খানিকটা ক্লেশ বিনিয়োগ করে দেখে নিতে হয়।

গল্পের পাটাতনে দাঁড়ানো মুশতাককে আমরা দেখেছি অনেক মুশতাকের প্রতিনিধি হিশেবে। মুশতাক বাস্তবিক অর্থে সামাজিক এবং বৈষয়িক হয়ে উঠতে পারেনি; সকলে সে রকম পারেও না। মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত, তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে না পারার পেছনে লুকিয়ে থাকা সত্যাসত্য তার কাছে কেবল ঘটনা বলে ঠেকে। কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তৈরি করতে পারে না মুশতাক। সব কিছুর মধ্যে সে স্বার্থপরতার গন্ধ পায় যেন! কিন্তু এতসব ভাবনা, কল্পনা আর বিচার-বিবেচনার মধ্যে হঠাৎ মুশতাককে অন্য এক অকল্পনীয় সত্যের মুখোমুখি হতে হয়। মুশতাকের মায়ের জবানিতে কাহিনি নির্মাতা পাঠককে জানাচ্ছেন সে কথা: 'বাপেরে জানে মারলি, সে সম মনে আছিল না? এখন আইছস মায়ের জল্লাদ হইয়া? যে কথা কাউরে কই নাই, তাই আমি আইজ চিল্লাইয়া কমু। তর জন্যে আইজ আমার এই শাস্তি। তুই, তুই মারছস তর বাপেরে।... সে মানুষটা সাঁতার জানতো না। আজরাইল হইয়া আইছিলি তুই মনে নাই? গাঙের পাড়ে খাড়াইয়া আছিল, ধাক্কা দিয়া তারে ফালাইলি। ভরা বর্ষার ঢল থিকা আর সে উইঠল না। আমার কপাল ভাইঙা এখন আমারেই শাসাস? কমুই তো, তর সাথে আমার কিসের সম্পর্ক।' তাহলে কি পিতার প্রতি অন্যায়ের দায়বোধ থেকে পাপমোচনের অনুভূতির পাটাতনে তৈরি হয়েছে এই গল্প! মুশতাকগণেরা কি তবে অপরাধের অতলে ডুবে না গিয়ে নিজেকে শাস্তি প্রদানের মধ্য দিয়ে শান্তি খুঁজে ফেরা কোনো স্বাভাবিক মানুষ! না কি জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানো ভীতু-অসংসারী-অবৈষয়িক ব্যক্তি মাত্র! কালো গরম কফির ধোঁয়ায় মুশতাকের চশমার কাঁচ আচ্ছন্ন হয়; এবং সত্যিই আচ্ছন্নের মতো চুমুক দেয় কালো কফিতে মুশতাক এবং মুশতাকগণ। নিশাত এবং নিশাতদের কাছে এইসব কালোকফি হেমলকের মতো ঠেকে। কালোকফির প্রিয় স্বাদ আর বাষ্পের মধুর স্পর্শের অন্তরালে মুশতাকের মনে আমরা একপ্রকার অবোধ্য জীবনবোধের জন্ম হতে দেখি। কিংবা বলা চলে জীবনের পাঠ ও পাটাতন পরিবর্তনের অপ্রতিরোধ্য ও অনিবার্য ধাপ অতিক্রম করতে দেখি। মুশতাক প্রদত্ত একটা বিবরণ দেখে নেওয়া যাক: 'কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমার সমুখে কালোকফি, তার ধোঁয়ায় চশমার কাচ হঠাৎ কুয়াশা হয়ে যাওয়া, এর সঙ্গে আমার বাবার মৃত্যুর ইতিহাস মনে পড়ে যাবার কোনো সম্পর্ক নেই। তবু মনে পড়ছে। এবং এত কঠিনভাবে মনে পড়েছে যে আমার পুরনো পৃথিবী ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে তার নির্মম আঘাতে, ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। আমি তাকিয়ে আছি পেয়ালায় রাখা কালোকফির দিকে। আস্তে আস্তে বাতাসে কেটে যাচ্ছে কাচ থেকে বাষ্পের কণাগুলো। স্বচ্ছ হয়ে আসছে। আবার আমি দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি মৃদু রেখায় তখনো ধোঁয়া উঠছে পেয়ালা থেকে।'

পিতৃহত্যার দায় কাঁধে-নেওয়া তরুণ ও স্বপ্নচারী অ্যাডভোকেট মুশতাকের জীবনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। তার কাছে সব কিছু অর্থহীন মনের হতে থাকে- নিশাতকে ঘিরে আবর্তিত সংসারের মালাও ছিঁড়ে যায় ওই চিন্তাদোলার প্রবলতায়। পরিচিত জনমানব ও জীবনের বাইরে চলে যেতে হয় মুশতাককে এবং কাউকে কিছু না জানিয়ে। জানানোর তাগিদও বোধ করেনি সে। হবু বউ নিশাতের জন্য মুশতাকের মা তাঁর বিয়ের শাড়িটা দিয়েছিল, সেটা আর নিশাতকে দেওয়া হয়নি। মায়ের সাথে দেখা করে ফেরার পর আর সে নিশাতের সাথে যোগাযোগ করেনি। নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে সবখান থেকে। নিজেকে বাবার হত্যাকারী ভেবে ভেবে যেন জীবনের আর কোনো কূল কিনারা নির্ধারণ করতে পারেনি মুশতাক। চশমার কাঁচ গলিয়ে তার চোখের ভিতরে কালোকফির ধোঁয়ার আবরণে কী এক দুর্বোধ্য ইন্দ্রজালের অবচেতনার দরোজা খুলে গেল; গ্লানি-পাপ আর ক্ষমাহীন অস্তিত্বের মোড়কে ঢাকা পড়লো সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাস্তব-বর্তমান। সম্ভাব্য সংসারের দিকে- অমিত সম্ভাবনার ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে মুশতাক স্মৃতির বারান্দায় কেবল হাতরে ফিরেছে নিজের ঘৃণ্যতম অপরাধের অস্তিত্ব। মুশতাকের এই অনুভবকে লেখক সাজিয়েছেন এভাবে:

'আমার যেন সমস্ত নীতি, শৃঙ্খলা-বোধ, সব তছনছ হয়ে গেছে; উচ্চাশা হাস্যকর, সংসার অসম্ভবের আহ্বান, কর্ম এবং অর্থ অর্থহীন। যে শাস্তি আইন আমাকে দিতে পারেনি, তার চেয়ে বড় শাস্তি সৃষ্টির সাধনা তখন আমি করছিলাম সমস্ত স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়ে, সাধ উপেক্ষা করে, আত্মপীড়ন আর বঞ্চনার ভেতর দিয়ে।' আত্মঅভিমানী মুশতাক যেন এক নবজন্মের দরোজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেল নতুন পৃথিবী; পাল্টে গেল তার জীবন-যাপন- সংসারের জাগতিকতাকে দুহাতে ঠেলে সে প্রবেশ করে অনিয়ন্ত্রিত-অস্বাভাবিক বাইট্রিলে জীবনের অসীম উদার পথের অভিমুখে। পূর্বের তাসের আড্ডা, সিগারেট ও সিনেমা এবং নতুন করে মদ্যপান ও নারীসঙ্গের ব্যাপারাদিতে আসক্ত হয় মুশতাক। নিজেকে জীবন-মৃত্যুর দায়মুক্ত এক পরমপুরুষ ভাবতে শিখেছিল সে- 'যার পাপে পাপ নেই, পুণ্যে প্রয়োজন নেই, বন্ধন যার কাছে এক অশ্রুত শব্দ।' প্রথমে সে সত্য থেকে পলায়নের দ্বিধায় খানিকটা আচ্ছন্ন হলেও পরে বিষয়টিকে একজাতীয় নিস্পৃহতা বলে বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। অতঃপর পরিবর্তিত জীবনের খোলা জমিনে দাঁড়িয়ে মুশতাক জীবন সম্বন্ধে কিছু পৌঢ়োক্তির অস্তিত্বও অনুভব করেছে। সে ভেবেছে:

> এক. 'মানুষ আবিষ্কার করতে পারে মহাদেশ, পর্বত, নক্ষত্র, জয় করতে পারে যুদ্ধ; সৃষ্টি করতে পারে সঙ্গীত; কিন্তু চির অচেনা চির অজেয় এবং স্বয়ম্ভু তার নিজেরই মন।'
>
> দুই. 'আসলে, আমাদের রক্তের ভেতরে রয়েছে পাপ আর বুদ্ধির মধ্যে পুণ্যের ধারণা। এই পাপের বেসাতিতে বন্ধু জোটে সহজে। রক্তের ডাক বলেই হয়ত পাপের বন্ধু যত নিকট হতে পারে পুণ্যের বন্ধু ততখানি হতে পারে না।'
>
> তিন. 'এখন আমার মনে হয় অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ আমাদের নিছক কল্পনা। সবকিছুই ঘটেছে এবং ঘটবে। জীবন এক অসম্ভব প্রস্তাব এবং তার সমাধা করতে হলে আমাদের কর্মগুলোকে অসম্ভবের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।'

কাহিনির শেষে মুশতাকের আরেক নবজন্মের সাথে পরিচিত হই আমরা। অগোছালা, বর্তমান ও বাস্তবতা থেকে পালিয়ে-বেড়ানো এই মানুষটিকে আমরা আবিষ্কার করি লেখকের টেবিলে। লেখার মধ্য দিয়ে নিজের গ্লানি-কষ্টবোধ, অপরাধ আর ভালোবাসাকে ফিরে পাবার আকুলতা প্রকাশের জন্য; আর আপন সৃজনশীলতার স্বকীয়তাকে মেলে ধরবার জন্য মানুষের যে স্বাভাবিক ও শৈল্পিক চেতনার নতুন ও চিরন্তন, মর্মরিত ও সুন্দর প্রকাশ থাকার দরকার, তা তুলে ধরবার জন্য মুশতাক অবশেষে লেখক হয়ে উঠল। গল্পকার সম্ভবত মানুষের বেঁচে থাকার প্রবণতাকে, নিজের স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতার শক্তিকে এভাবে কোনো এক মুশতাকের জেগে ওঠার মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে পরিবেশন করতে চেয়েছেন। তিনি বোধহয় বলতে চেয়েছেন যে, মানসিক পরিভ্রমণের পথ পারি দিয়ে জীবন-যন্ত্রণায় বিপন্ন মুশতাকগণ এভাবেই অভিজ্ঞতা আর মুল্যবোধকে মুলধন করে আত্মপ্রতিফলনের আলোয় আত্মবিভ্রমের জগৎ থেকে বাস্তবের দুনিয়ায় জেগে থাকে যাবতীয় ক্ষুধা, স্বপ্ন, দুরন্ত মমতা আর অতল ভালোবাসাকে আশ্রয় করে।

উপন্যাসটির পাঠ শেষ হলে মনে হয়- জীবন-জিজ্ঞাসার নানাবিধ নিংড়ানো আলোকরশ্মি ঠিক যেন ঠিকরে পড়েছে *জনক* ও *কালোকফি*র নায়ক মুশতাকের চরিত্রে। তার প্রভাব ছড়িয়েছে নিশাতসহ অন্যান্য পাত্র-পাত্রীর মধ্যেও। কোনো চরিত্রই কৃত্রিমতায় আড়ষ্ট নয়; বানানো ছাঁচের আড়ালে যেন জীবনকে নিবিড়ভাবে দেখবার প্রবণতা এ কাহিনির সর্বত্র রঙ-রেখায় বিবৃত। কথানির্মাতা সৈয়দ হক আবিষ্কার ও প্রকাশ করেছেন ব্যক্তির মনোভ্রামণিক এবং মনোবিশ্লেষণিক চিন্তারাজি ও কথামালা।

ড. ফজলুল হক সৈকত, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কবি-কথানির্মাতা-প্রাবন্ধিক; রেডিও সংবাদ পাঠক; কলামলেখক।
ই-মেইল: snue90@yahoo.com, fsaikat26@gmail.com, ফোন: ০১৮২৪৫১৬০৮৮

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন